বারীন ভৌমিকের ব্যারাম

কনডাক্টরের নির্দেশমতো 'ডি' কামরায় ঢুকে বারীন ভৌমিক তাঁর সুটকেসটা সিটের নিচে ঢুকিয়ে দিলেন। ওটা পথে খোলার দরকার হবে না। ছোট ব্যাগটা হাতের কাছে রাখা দরকার। চিরুনি, বুরুশ, টুথ-ব্রাশ, দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম, ট্রেনে পড়ার জন্য হ্যাড়লি চেজের বই—সবই রয়েছে ঐ ব্যাগে। আর আছে থ্রোট পিল্‌স। ঠাণ্ডা ঘরে ঠাণ্ডা লেগে গলা বসে গেলে কাল গান খুলবে না। চট করে একটা বড়ি মুখে পুরে দিয়ে বারীন ভৌমিক ব্যাগটাকে জানালার সামনে টেবিলটার উপর রেখে দিলেন।

দিল্লীগামী ভেস্টিবিউল ট্রেন, ছাড়তে আর মাত্র সাত মিনিট বাকি, অথচ তাঁর কামরায় আর প্যাসেঞ্জার নেই কেন ? এতখানি পথ কি তিনি একা যাবেন ? এতটা সৌভাগ্য কি তাঁর হবে ? এ যে একেবারে আয়েশের পরাকাষ্ঠা ! অবস্থাটা কল্পনা করে বারীন ভৌমিকের গলা থেকে আপনিই একটা গানের কলি বেরিয়ে পড়ল—বাগিচায় বুলবুল তুই ফুলশাখাতে দিস্‌নে আজি দোল !

বারীন ভৌমিক জানালা দিয়ে বাইরে হাওড়া স্টেশন প্ল্যাটফর্মের জনস্রোতের দিকে চাইলেন। দুটি ছোকরা তাঁর দিকে চেয়ে পরস্পরে কী যেন বলাবলি করছে। বারীনকে চিনেছে তারা। অনেকেই চেনে। অন্তত কলকাতা শহরের, এবং অনেক বড় বড় মফস্বল শহরের অনেকেই শুধু তাঁর কণ্ঠস্বর নয়, তাঁর চেহারার সঙ্গেও পরিচিত। প্রতি মাসেই পাঁচ-সাতটা ফাংশনে তাঁর ডাক পড়ে। বারীন ভৌমিক—গাইবেন নজরুলগীতি ও আধুনিক। খ্যাতি ও অর্থ—দুই-ই এখন বারীন ভৌমিকের হাতের মুঠোয়। অবিশ্যি এটা হয়েছে বছর পাঁচেক হল। তার আগে কয়েকটা বছর তাঁকে বেশ, যাকে বলে, স্ট্রাগলই করতে হয়েছে। গানের জন্য নয়। গাইবার ক্ষমতাটা তাঁর সহজাত। কিন্তু শুধু গাইলেই তো আর হয় না। তার সঙ্গে চাই কপালজোর, আর চাই ব্যাকিং।

suman_ahm@yahoo.com

বারীন ভৌমিকের ব্যারাম

উনিশ শো সাতষট্টি সালে উনিশ পল্লীর পুজো প্যান্ডেলে ভোলাদা—ভোলা বাঁড়ুজ্যে—তাঁকে দিয়ে যদি না জোর করে 'বসিয়া বিজনে' গানখানা গাওয়াতেন...

বারীন ভৌমিকের দিল্লী যাওয়াটাও এই গানেরই দৌলতে। দিল্লীর বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন তাঁকে ফার্স্ট ক্লাসের খরচ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের জুবিলী অনুষ্ঠানে নজরুলগীতি পরিবেশনের উদ্দেশ্যে। থাকার ব্যবস্থাও অ্যাসোসিয়েশনই করবে। দুদিন দিল্লীতে থেকে তারপর আগ্রা-ফতেপুর সিক্রি দেখে ঠিক সাতদিন পরে আবার কলকাতায় ফিরবেন বারীন ভৌমিক। তারপর পুজো পড়ে গেলে তাঁর আর অবসর নেই ; প্রহরে প্রহরে হাজিরা দিতে হবে গানের আসরে, শ্রোতাদের কানে মধুবর্ষণ করার জন্য।

'আপনার লাঞ্চের অর্ডারটা স্যার...'

কন্‌ডাক্টর গার্ড এসে দাঁড়িয়েছেন।

'কী পাওয়া যায় ?' বারীন প্রশ্ন করলেন।

'আপনি নন-ভেজিটেরিয়ান তো ? দিশি খাবেন না ওয়েস্টার্ন স্টাইল ? দিশি হলে আপনার...'

বারীন নিজের পছন্দমতো লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে সবেমাত্র একটি থ্রী কাস্‌লস ধরিয়েছেন, এমন সময় আরেকটি প্যাসেঞ্জার এসে কামরায় ঢুকলেন, এবং ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লীর গাড়ি গা-ঝাড়া দিয়ে তার যাত্রা শুরু করল।

নবাগত যাত্রীটির সঙ্গে চোখাচুখি হতেই তাঁকে চেনা মনে হওয়ায় বারীনের মুখে একটা হাসির আভাস দেখা দিয়ে আগন্তুকের দিক থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে মুহূর্তেই মিলিয়ে গেল। বারীন কি তাহলে ভুল করলেন ? ছি ছি ছি ! এই অবিবেচক বোকা হাসিটার কী দরকার ছিল। কী অপ্রস্তুত ! মনে পড়ল একবার রেসের মাঠে একটি ব্রাউন পাঞ্জাবীপরা প্রৌঢ় ভদ্রলোককে পিছন দিক থেকে 'কী খ্‌খবো-র ত্রিদিবদা' বলে পিঠে একটা প্রচণ্ড চাপড় মারার পরমুহূর্তেই বারীন বুঝেছিলেন তিনি আসলে ত্রিদিবদা নন। এই লজ্জাকর ঘটনার স্মৃতি তাঁকে অনেক দিন ধরে যন্ত্রণা দিয়েছিল। মানুষকে অপদস্থ করার জন্য কত রকম ফাঁদ যে চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে !

বারীন ভৌমিক আরেকবার আগন্তুকের দিকে দৃষ্টি দিলেন। ভদ্রলোক স্যান্ডাল খুলে সিটের উপর পা ছড়িয়ে বসে সদ্য কেনা ইলাস্‌ট্রেটেড উইক্‌লিটা নেড়ে-চেড়ে দেখছেন। কী আশ্চর্য ! আবার মনে হচ্ছে তিনি লোকটিকে আগে দেখেছেন। নিমেষের দেখা নয়, তার চেয়ে অনেক বেশিক্ষণের দেখা। কিন্তু কবে ? কোথায় ? ঘন ভুরু, সরু গোঁফ, পমেড দিয়ে পালিশ করা চুল, কপালের ঠিক মাঝখানে একটা ছোট্ট আঁচিল। এ মুখ তাঁর চেনা। নিশ্চয়ই চেনা। তিনি যখন সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফে চাকরি করতেন তখনকার চেনা কি ? কিন্তু একতরফা

চেনা হয় কী করে ? ওঁর হাবভাব দেখে তো মনে হয় না যে তিনি কস্মিনকালেও বারীন ভৌমিককে দেখেছেন।

'আপনার লাঞ্চের অর্ডারটা...'

আবার কন্‌ডাক্টর গার্ড। বেশ হাসিখুশি হৃষ্টপুষ্ট অমায়িক ভদ্রলোকটি।

'শুনুন,' আগন্তুক বললেন, 'লাঞ্চ তো হল—আগে এক কাপ চা হবে কি ?'

'সার্টেনলি।'

'শুধু একটা কাপ আর লিকার দিলেই হবে। আমি র' টী খাই।'

বারীন ভৌমিকের হঠাৎ মনে হল তাঁর তলপেট থেকে নাড়িভুঁড়ি সব বেরিয়ে গিয়ে জায়গাটা একদম খালি হয়ে গেছে। আর তার পরেই মনে হল তাঁর হৃৎপিণ্ডটা হঠাৎ হাত-পা গজিয়ে ফুসফুসের খাঁচাটার মধ্যে লাফাতে শুরু করেছে। শুধু গলার স্বর নয়, ওই গলার স্বরে বিশেষভাবে বিশেষ জোর দিয়ে বলা শুধু একটি কথা—র' টী—ব্যাস্। ওই একটি কথা বারীনের মনের সমস্ত অনিশ্চয়তাকে এক ধাক্কায় দূর করে দিয়ে সেই জায়গায় একটি স্থির প্রত্যয়কে এনে বসিয়ে দিয়েছে।

বারীন যে এই ব্যক্তিটিকে শুধু দেখেছেন তা নয়, তাঁর সঙ্গে ঠিক এই একইভাবে দিল্লীগামী ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর শীততাপনিয়ন্ত্রিত কামরায় মুখোমুখি বসে একটানা প্রায় আট ঘণ্টা ভ্রমণ করেছেন। তিনি নিজে যাচ্ছিলেন পাটনা, তাঁর আপন মামাতো বোন শিপ্রার বিয়েতে। তার তিন দিন আগে রেসের মাঠে ট্রেব্‌ল টোটে একসঙ্গে সাড়ে সাত হাজার টাকা জিতে তিনি জীবনে প্রথমবার প্রথম শ্রেণীতে ট্রেনে চড়ার লোভ সামলাতে পারেননি। তখনও তাঁর গাইয়ে হিসেবে নাম হয়নি ; ঘটনাটা ঘটে সিক্সটি-ফোরে। —ন'বছর আগে। ভদ্রলোকের পদবীটাও যেন আবছা-আবছা মনে পড়ছে। 'চ' দিয়ে। চৌধুরী ? চক্রবর্তী ? চ্যাটার্জি ?...

কন্‌ডাক্টর গার্ড লাঞ্চের অর্ডার নিয়ে চলে গেলেন। বারীন অনুভব করলেন তিনি আর এই লোকটার মুখোমুখি বসে থাকতে পারছেন না। বাইরে করিডরে গিয়ে দাঁড়ালেন, দরজার মুখ থেকে পাঁচ হাত ডাইনে, 'চ'-এর দৃষ্টির বেশ কিছুটা বাইরে। কোইন্সিডেন্সের বাংলা বারীন ভৌমিক জানেন না, কিন্তু এটা জানেন যে, প্রত্যেকের জীবনেই ও জিনিসটা বার কয়েক ঘটে থাকে। কিন্তু তা বলে এই রকম কোইন্সিডেন্স ?

কিন্তু 'চ' কি তাঁকে চিনেছেন ? না-চেনার দুটো কারণ থাকতে পারে। এক, হয়তো 'চ'-এর স্মরণশক্তি কম ; দুই, হয়তো এই ন'বছরে বারীনের চেহারার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। জানালা দিয়ে বাইরের চলমান দৃশ্যের দিকে দেখতে দেখতে বারীন ভাবতে চেষ্টা করলেন, তাঁর ন'বছর আগের চেহারার সঙ্গে

আজকের চেহারার কী তফাত থাকতে পারে।

ওজন বেড়েছে অনেক, সুতরাং অনুমান করা যায় তাঁর মুখটা আরো ভরেছে। আর কী ? চশমা ছিল না, চশমা হয়েছে। গোঁফ ? কবে থেকে গোঁফ কামিয়ে ফেলেছেন তিনি ? হ্যাঁ, মনে পড়েছে। খুব বেশিদিন নয়। হাজরা রোডের সেই সেলুন। একটা নতুন ছোক্‌রা নাপিত। দুপাশের গোঁফ মিলিয়ে কাটতে পারল না। বারীন নিজে ততটা খেয়াল করেননি, কিন্তু আপিসের সেই গোপ্‌পে লিফ্‌টম্যান শুকদেও থেকে শুরু করে বাষট্টি বছরের বুড়ো ক্যাশিয়ার কেশববাবু পর্যন্ত যখন সেই নিয়ে মন্তব্য করলেন তখন বারীন মরিয়া হয়ে তাঁর সাধের গোঁফটি কামিয়ে ফেলেন। সেই থেকে আর রাখেননি। এটা চার বছর আগের ঘটনা।

গোঁফ বাদ, গালে মাংসযোগ, চোখে চশমাযোগ। বারীন খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে আবার কামরায় এসে ঢুকলেন।

বেয়ারা একটা ট্রেতে চায়ের কাপ আর টি-পট 'চ'-এর সামনে পেতে দিয়ে চলে গেল। বারীনও পানীয়ের প্রয়োজনবোধ করছিলেন—ঠাণ্ডা হোক, গরম হোক—কিন্তু বলতে গিয়েও বললেন না।

যদি গলার স্বরে চিনে ফেলে !

আর চিনলে পরে যে কী হতে পারে সেটা বারীন কল্পনাও করতে চান না। অবিশ্যি সবই নির্ভর করে 'চ' কি রকম লোক তার উপর। যদি অনিমেষদার মতো হন, তাহলে বারীন নিস্তার পেলেও পেতে পারেন। একবার বাসে একটা লোক অনিমেষদার পকেট হাতড়াচ্ছিল। টের পেয়েও লজ্জায় তিনি কিছু বলতে পারেননি। মানিব্যাগ সমেত চারটি দশ টাকার করকরে নোট তিনি পকেটমারটিকে প্রায় একরকম দিয়েই দিয়েছিলেন। পরে বাড়িতে এসে বলেছিলেন, 'পাবলিক বাসে একগাড়ি লোকের ভেতর একটা সীন হবে, আর তার মধ্যে একটা প্রমিনেন্ট পার্ট নেব আমি—এ হতে দেওয়া যায় না।' এই লোক কি সেই রকম ? না হওয়াটাই স্বাভাবিক ; কারণ অনিমেষদার মতো লোক বেশি হয় না। তাছাড়া চেহারা দেখেও মনে হয় এ-লোক সে-রকম নয়। ওই ঘন ভুরু, ঠোক্কর খাওয়া নাক, সামনের দিকে বেরিয়ে থাকা থুতনি—সব মিলিয়ে মনে হয়, এ-লোক বারীনকে চিনতে পারলেই তার লোমশ হাত দিয়ে শার্টের কলারটা খামচে ধরে বলবে, 'আপনিই সেই লোক না ?—যিনি সিক্সটি-ফোরে আমার ঘড়ি চুরি করেছিলেন ? স্কাউন্ড্রেল ! এই ন'বছর ধরে তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি আমি। আজ আমি তোমার...'

আর ভাবতে পারলেন না বারীন ভৌমিক। এই ঠাণ্ডা কামরাতেও তাঁর কপাল ঘেমে উঠেছে। রেলওয়ের রেক্সিনে মোড়া বালিশে মাথা দিয়ে তিনি

সটান সিটের উপর শুয়ে পড়ে বাঁ হাতটা দিয়ে চোখটা ঢেকে নিলেন। চোখ দেখেই সবচেয়ে সহজে মানুষকে চিনতে পারা যায়। বারীনও প্রথমে চোখ দেখেই 'চ'কে চিনতে পেরেছিলেন।

প্রত্যেকটি ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাঁর মনে পড়ছে। শুধু 'চ'-এর ঘড়ি চুরির ঘটনা না। সেই ছেলে-বয়েসে যার যা কিছু চুরি করেছেন সব তিনি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন। একেক সময় খুবই সামান্য সে জিনিস। হয়তো একটা সাধারণ ডট পেন (মুকুলমামার), কিংবা একটা সস্তা ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস (তাঁর স্কুলের সহপাঠী অক্ষয়ের), অথবা ছেনিদার একজোড়া হাড়ের কাফলিংক্‌স, যেটার কোনোও প্রয়োজন ছিল না বারীনের, কোনোদিন ব্যবহারও করেননি। চুরির কারণ এই যে, সেগুলো হাতের কাছে ছিল, এবং সেগুলো অন্যের জিনিস। বারো বছর বয়স থেকে শুরু করে পঁচিশ বছর পর্যন্ত কমপক্ষে পঞ্চাশটা পরের জিনিস বারীন ভৌমিক কোনো না কোনো উপায়ে আত্মসাৎ করে নিজের ঘরে নিজের কাছে এনে রেখেছেন। একে চুরি ছাড়া আর কী বলা যায়? চোরের সঙ্গে তফাত শুধু এই যে, চোর চুরি করে অভাবের তাড়নায়, আর তিনি করেছেন অভ্যাসের বশে। লোকে তাঁকে কোনোদিন সন্দেহ করেনি, তাই কোনোদিন ধরা পড়তে হয়নি। বারীন জানেন যে এইভাবে চুরি করাটা একটা ব্যারাম বিশেষ। একবার কথাচ্ছলে এক ডাক্তার বন্ধুর কাছ থেকে তিনি ব্যারামের নামটাও জেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু এখন মনে পড়ছে না।

তবে ন'বছর আগে 'চ'-এর ঘড়ি নেওয়ার পর থেকে আজ অবধি এ কাজটা বারীন আর কক্ষনো করেননি। এমন কি করার সেই সাময়িক অথচ প্রবল আকাঙ্ক্ষাটাও অনুভব করেননি। বারীন জানেন যে এই উৎকট রোগ থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছেন।

তাঁর অন্যান্য চুরির সঙ্গে ঘড়ি চুরির একটা তফাত ছিল এই যে, ঘড়িটায় তাঁর সত্যিই প্রয়োজন ছিল। রিস্টওয়াচ না; সুইজারল্যান্ডে তৈরি একটি ভারী সুন্দর ট্র্যাভলিং ক্লক। একটা নীল চতুষ্কোণ বাক্স, তার ঢাকনাটা খুললেই ঘড়িটা বেরিয়ে এসে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অ্যালার্ম ঘড়ি, আর সেই অ্যালার্মের শব্দ এতই সুন্দর যে ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে কান জুড়িয়ে যায়। এই ন'বছর সমানে সেটা ব্যবহার করেছেন বারীন ভৌমিক। তিনি যেখানেই গেছেন, সেখানেই সঙ্গে গেছে ঘড়ি।

আজকেও সে ঘড়ি তাঁর সঙ্গেই আছে। জানালার সামনে ওই টেবিলের উপর রাখা ব্যাগের মধ্যে।

'কদ্দুর যাবেন?'

বারীন তড়িৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠলেন। লোকটা তাঁর সঙ্গে কথা বলছে,

তাঁকে প্রশ্ন করছে।

'দিল্লী।'

'আজ্ঞে?'

'দিল্লী।'

প্রথমবার অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে গিয়ে একটু বেশি আস্তে উত্তর দিয়ে ফেলেছিলেন বারীন।

'আপনার কি ঠাণ্ডায় গলা বসে গেল নাকি।'

'নাঃ।'

'ওটা হয় মাঝে মাঝে। অ্যাকচুয়েলি এয়ার কন্ডিশনিং-এর একমাত্র লাভ হচ্ছে ধুলোর হাত থেকে রেহাই পাওয়া। নাহলে আমি এমনি ফার্স্ট ক্লাসেই যেতুম।'

বারীন চুপ। পারলে তিনি 'চ'-এর দিকে তাকান না, কিন্তু 'চ' তাঁর দিকে দেখছে কিনা সেটা জানার দুর্নিবার কৌতূহলই তাঁর দৃষ্টি বার বার ভদ্রলোকের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু 'চ' নিরুদ্বিগ্ন, নিশ্চিন্ত। অভিনয় কী? সেটা বারীন জানেন না। সেটা জানতে হলে লোকটিকে আরো ভালো করে জানা দরকার। বারীন যেটুকু জানেন সেটা তাঁর গতবারের জানা। এক হল দুধ-চিনি ছাড়া চা-পানের অভ্যাস। আরেক হল স্টেশন এলেই নেমে গিয়ে কিছু না কিছু খাবার জিনিস কিনে আনা। নোন্‌তা জিনিস, মিষ্টি নয়। মনে আছে গতবার বারীন ভৌমিকের অনেক রকম মুখরোচক জিনিস খাওয়া হয়ে গিয়েছিল 'চ'-এর দৌলতে।

এছাড়া তাঁর চরিত্রের আরেকটা দিক প্রকাশ পেয়েছিল পাটনা স্টেশনের কাছাকাছি এসে। এটার সঙ্গে ঘড়ির ব্যাপারটা জড়িত। তাই ঘটনাটা বারীনের স্পষ্ট মনে আছে। সেবার গাড়িটা ছিল অমৃতসর মেল। পাটনা পৌঁছবে ভোর পাঁচটায়। কন্ডাক্টর এসে সাড়ে চারটেয় তুলে দিয়েছেন বারীনকে। 'চ'ও আধ-জাগা, যদিও তিনি যাচ্ছেন দিল্লী। গাড়ি স্টেশনে পৌঁছাবার ঠিক তিন মিনিট আগ হঠাৎ ঘ্যাঁচ করে থেমে গেল। ব্যাপার কী? লাইনের উপর দিয়ে ল্যাম্প ও টর্চের ছুটোছুটি দেখে মনে হল কোনো গোলমাল বেধেছে। শেষটায় গার্ড এসে বললেন একটা বুড়ো নাকি লাইন পার হতে গিয়ে এঞ্জিনে কাটা পড়েছে। তার লাশ সরালেই গাড়ি চলবে। 'চ' খবরটা পাওয়ামাত্র ভারি উত্তেজিত হয়ে স্লিপিং সুট পরেই অন্ধকারে নেমে চলে গেলেন ব্যাপারটা চাক্ষুষ দেখে আসতে।

এই সুযোগেই বারীন তাঁর বাক্স থেকে ঘড়িটি বার করে নেন। সেই রাত্রেই 'চ'কে দেখেছিলেন সেটায় দম দিতে। লোভও যে লাগেনি তা নয়, তবে

সুযোগের অভাব হবে জেনে ঘড়ির চিন্তা মন থেকে দূর করে দিয়েছিলেন। এই মুহূর্তে অপ্রত্যাশিতভাবে সে সুযোগ এসে পড়াতে সে-লোভ এমনভাবে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে যে, বাঙ্কের উপর অন্য একটি ঘুমন্ত প্যাসেঞ্জার থাকা সত্ত্বেও তিনি ঝুঁকি নিতে দ্বিধা করেননি। কাজটা করতে তাঁর লাগে মাত্র পনের-বিশ সেকেন্ড। 'চ' ফিরলেন প্রায় পাঁচ মিনিট পরে।

'হরিব্‌ল ব্যাপার! ভিখিরি। ধড় একদিকে, মুড়ো একদিকে। সামনে কাউক্যাচার থাকতে কাটা যে কেন পড়ে বুঝতে পারি না মশাই। ওটার উদ্দেশ্য তো লাইনে কিছু পড়লে সেটাকে ঠেলে বাইরে ফেলে দেওয়া!...'

পাটনায় নেমে স্টেশন থেকে বেরিয়ে মেজোমামার মোটরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই বারীন ভৌমিকের তলপেটের অসোয়াস্তিটা ম্যাজিকের মতো উবে যায়। তাঁর মন বলে, ঘড়ির মালিকের সঙ্গে এতকাল যে ব্যবধান ছিল—কেউ কারুর নাম শোনেনি, কেউ কাউকে দেখেনি—গত আট ঘণ্টার আকস্মিক সান্নিধ্যের পর আবার সেই ব্যবধান এসে পড়েছে। এর পরে আবার কোনো দিন পরস্পরের দেখা হওয়ার সম্ভাবনা কোটিতে এক। কিংবা হয়তো তার চেয়েও কম।

কিন্তু এই তিলপ্রমাণ সম্ভাবনাই যে ন'বছর পরে হঠাৎ সত্যে পরিণত হবে সেটা কে জানত? বারীন মনে মনে বললেন, এই ধরনের ঘটনা থেকেই মানুষ কুসংস্কারের জালে জড়িয়ে পড়ে।

'আপনি কি দিল্লীর বাসিন্দা, না কলকাতার?'

বারীনের মনে পড়ল সেবারও লোকটা তাঁকে নানারকম প্রশ্ন করেছিল। এই গায়ে পড়া আলাপ করার বাতিকটা বারীন পছন্দ করেন না।

'কলকাতা,' বারীন জবাব দিলেন। তাঁর অজান্তেই তাঁর স্বাভাবিক গলার স্বরটা বেরিয়ে পড়েছে। বারীন নিজেকে ধিক্কার দিলেন। ভবিষ্যতে তাঁকে আরো সতর্ক হতে হবে।

কিন্তু এ কী! ভদ্রলোক তাঁর দিকে এভাবে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন কেন? সহসা এ হেন কৌতূহলের কারণ কী? বারীন অনুভব করলেন তাঁর নাড়ি আবার চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

'আপনার কি রিসেন্টলি কোনো ছবি বেরিয়েছে কাগজে?'

বারীন বুঝলেন এ ব্যাপারে সত্য গোপন করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, ট্রেনে অন্যান্য বাঙালী যাত্রী রয়েছে, তাদের মধ্যে কেউ না কেউ তাঁকে চিনে ফেললেও ফেলতে পারে। এর কাছে নিজের পরিচয়টা দিলে ক্ষতি কী? বরং বারীন যে একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি সেটা জানলে পরে ন'বছর আগের সেই ঘড়ি-চোরের সঙ্গে তাঁকে এক করে দেখা 'চ'-এর পক্ষে আরো অসম্ভব হবে।

'কোথায় দেখেছেন আপনি ছবি?' বারীন পাল্টা প্রশ্ন করলেন।

'আপনি গান করেন কি ?' আবার প্রশ্ন।

'হ্যাঁ, তা একটু-আধটু...'

'আপনার নামটা... ?'

'বারীন্দ্রনাথ ভৌমিক।'

'তাই বলুন। বারীন ভৌমিক। তাই চেনা-চেনা মনে হচ্ছিল। আপনি তো রেডিওতেও গেয়ে থাকেন মাঝে মাঝে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আমার স্ত্রী আপনার খুব ভক্ত। দিল্লী যাচ্ছেন কি গানের ব্যাপারে ?'

'হ্যাঁ।'

বেশি ভেঙে বলবেন না বারীন। শুধু হ্যাঁ বা না-য়ে যদি উত্তর হয়, তবে তাই বলবেন।

'দিল্লীতে এক ভৌমিক আছে—ফিনান্সে। স্কটিশে পড়ত আমার সঙ্গে। নীতীশ ভৌমিক। আপনার কোনো ইয়ে-টিয়ে নাকি ?'

ইয়ে-টিয়েই বটে। বারীনের খুড়তুতো দাদা। কড়া সাহেবী মেজাজের লোক, তাই বারীনের আত্মীয় হলেও সমগোত্রীয় নয়।

'আজ্ঞে না। আমি চিনি না।'

এখানে মিথ্যে বলাটাই শ্রেয় বিবেচনা করলেন বারীন। লোকটা এবার কথা বন্ধ করলে পারে। এত জেরা কেন রে বাপু।

যাক্, লাঞ্চ এসে গেছে। আশা করি কিছুক্ষণের জন্য প্রশ্নবাণ বন্ধ হবে।

হলও তাই। 'চ' ভোজনরসিক। একবার মুখে খাদ্য প্রবেশ করলে কথার রাস্তা যেন আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বারীন ভৌমিকের ভয় খানিকটা কেটে গেলেও একটা অসোয়াস্তি এখনো রয়ে গেছে। এখনো বিশ ঘণ্টার পথ বাকি। মানুষের স্মৃতিভাণ্ডার বড় আশ্চর্য জিনিস। কিসে খোঁচা মেরে কোন্ আদ্যিকালের কোন্ স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলবে তার কিচ্ছু ঠিক নেই। ওই যেমন র' টী। বারীনের বিশ্বাস ওই বিশেষ কথাটা না শুনলে যে সেই ন'বছর আগের ঘড়ির মালিক 'চ' সে ধারণা কিছুতেই ওর মনে বদ্ধমূল হত না। সে-রকম বারীনেরও কোনো কথায় বা কাজে যদি তাঁর পুরনো পরিচয়টা 'চ'-এর কাছে ধরা পড়ে যায় ?

এইসব ভেবে বারীন স্থির করলেন যে তিনি কথাও বলবেন না, কাজও করবেন না। খাবার পর মুখের সামনে হ্যাড়লি চেজের বইটা খুলে বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে রইলেন। প্রথম পরিচ্ছেদটা শেষ করে সাবধানে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন যে 'চ' ঘুমিয়ে পড়েছে। অন্তত দেখলে তাই মনে হয়। ইলাস্ট্রেটেড

উইক্‌লিটা হাত থেকে মেঝেতে পড়ে গেছে, চোখ দুটো হাতে ঢাকা, কিন্তু বুকের ওঠা-নামা দেখে ঘুমন্ত লোকের স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ নিশ্বাস বলেই মনে হয়। বারীন জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চাইলেন। মাঠ-ঘাট, গাছপালা, খোলার বাড়ি মিলিয়ে বেহারের রুক্ষ দৃশ্য। জানালার ডবল কাঁচ ভেদ করে ট্রেনের শব্দ প্রায় পাওয়াই যায় না। যেন দূর থেকে শোনা অনেক মৃদঙ্গে একইসঙ্গে একই বোল তোলার শব্দ—ধাদ্ধিনাক্‌ নাদ্ধিনাক্‌ ধাদ্ধিনাক্‌ নাদ্ধিনাক্‌ ধাদ্ধিনাক্‌ নাদ্ধিনাক্‌...

এই শব্দের সঙ্গে এবার যোগ হল আরেকটি শব্দ, 'চ'-এর নাসিকাধ্বনি।

বারীন ভৌমিক অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করলেন। নজরুলের একটা বাছাই করা গানের প্রথম লাইনটা গুনগুন করে দেখলেন। সকালের মতো অতটা মসৃণ না হলেও, গলাটা তাঁর নিজের কানে খারাপ লাগল না। এবার বেশি শব্দ না করে গলাটা খাঁক্‌রে তিনি গানটা আবার ধরলেন। এবং ধরেই তৎক্ষণাৎ তাঁকে থেমে যেতে হল।

একটা চরম বিভীষিকাজনক শব্দ তাঁর গলা শুকিয়ে দিয়ে গান বন্ধ করে দিয়েছে।

ঘড়িতে অ্যালার্ম বাজার শব্দ।

তাঁর ব্যাগের মধ্যে রাখা সুইস ঘড়িতে কেমন করে জানি অ্যালার্ম বেজে উঠেছে। এবং বেজেই চলেছে। বারীন ভৌমিকের হাত-পা পেটের মধ্যে সিঁধিয়ে গেছে। তাঁর দেহ কাষ্ঠবৎ। তাঁর দৃষ্টি ঘুমন্ত 'চ'-এর দিকে নিবদ্ধ।

'চ'-এর হাত যেন একটু নড়ল। বারীন প্রমাদ গুনলেন।

'চ'-এর ঘুম ভেঙেছে। চোখের উপর থেকে হাত সরে এল।

'গেলাসটা বুঝি ? ওটাকে নামিয়ে রাখুন তো—ভাইব্রেট করছে।'

বারীন ভৌমিক দেয়ালে লাগানো লোহার আংটার ভেতর থেকে গেলাসটা তুললেই শব্দটা থেমে গেল। সেটা টেবিলে রাখার আগে তার ভিতরের জলটুকু খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে তিনি খানিকটা আরাম পেলেন। তবু গানের অবস্থায় আসতে দেরি আছে।

হাজারিবাগ রোডের কিছু আগে চা এল। পর পর দু পেয়ালা গরম চা খেয়ে এবং 'চ'-এর কাছ থেকে আর কোনোরকম জেরা বা সন্দেহের কোনো লক্ষণ না পেয়ে বারীনের গলা আরো অনেকটা খোলসা হল। বাইরে বিকেলের পড়ন্ত রোদ আর দূরের টিলার দিকে চেয়ে গাড়ির ছন্দের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে একটা আধুনিক গানের খানিকটা গুনগুন করে গেয়ে আসন্ন বিপদের শেষ আশঙ্কাটুকু তাঁর মন থেকে কেটে গেল।

গয়াতে 'চ' তাঁর ন'বছরের আগের অভ্যাস অনুযায়ী প্ল্যাটফর্মে নেমে সেলোফোনে মোড়া দু প্যাকেট চানাচুর কিনে এনে তার একটা বারীন ভৌমিককে

দিলেন। বারীন দিব্যি তৃপ্তির সঙ্গে সেটা খেলেন। গাড়ি ছাড়ার মুখে সূর্য ডুবে গেল। ঘরের বাতিগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে 'চ' বললেন—

'আমরা কি লেট রান করছি ? আপনার ঘড়িতে কটা বাজে ?'

এই প্রথম বারীন ভৌমিকের খেয়াল হল যে 'চ'-এর হাতে ঘড়ি নেই। ব্যাপারটা অনুধাবন করে তিনি বিস্মিত হলেন এবং হয়তো সে বিস্ময়ের খানিকটা তাঁর চাহনিতে প্রকাশ পেল। পরমুহূর্তেই খেয়াল হল 'চ'-এর প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়নি। নিজের ঘড়ির দিকে একঝলক দৃষ্টি দিয়ে বললেন, 'সাতটা পঁয়ত্রিশ।'

'তাহলে তো মোটামুটি টাইমেই যাচ্ছি।'

'হ্যাঁ।'

'আমার ঘড়িটা আজই সকালে...এইচ এম টি...দিব্যি টাইম দিচ্ছিল...বিছানার চাদর ধরে এমন এক টান দিয়েছে যে ঘড়ি একেবারে...'

বারীন চুপ। তটস্থ। ঘড়ির প্রসঙ্গ তাঁর কাছে ষোল আনা অপ্রীতিকর, অবাঞ্ছনীয়।

'আপনার কী ঘড়ি ?'

'এইচ এম টি।'

'ভালো সার্ভিস দিচ্ছে ?'

'হুঁ।'

'আসলে আমার ঘড়ির লাকটাই খারাপ।'

বারীন ভৌমিক একটা হাই তুলে নিজেকে নিরুদ্বিগ্ন প্রতিপন্ন করার চেষ্টায় ব্যর্থ হলেন। তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অসাড়তা চোয়াল পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। মুখ খুলল না। শ্রবণশক্তি লোপ পেলে তিনি সবচেয়ে খুশি হতেন, কিন্তু তা হবার নয়। 'চ'-এর কথা দিব্যি তাঁর কানে প্রবেশ করছে—

'একটা সুইস ঘড়ি, জানেন—সোনার—ট্র্যাভলিং ক্লক—জিনিভা থেকে এনে দিয়েছিল আমার এক বন্ধু—এক মাসও ব্যবহার করিনি...ট্রেনে যাচ্ছি দিল্লী—বছর আষ্টেক আগে—এই যে আমি-আপনি ট্র্যাভ্‌ল করছি, সেই রকম একটা কামরায় আমরা দুজন—আমি আর একটি ভদ্রলোক—বাঙালী...কী ডেয়ারিং ভেবে দেখুন! হয়তো বাথরুমে-টাথরুমে গেছি, কি স্টেশন এসেছে, প্ল্যাটফর্মে নেমেছি—আর সেই ফাঁকে ঘড়িটাকে বেমালুম ঝেপে দিল! অথচ দেখে বোঝার জো নেই—ফার্স্ট ক্লাসে যাচ্ছে, দিব্যি ভদ্দরলোকের মতো চেহারা। খুন-টুন যে করে বসেনি এই ভাগ্যি। তারপর থেকে তো আর ট্রেনেই চড়িনি। এবারও প্লেনেই যেতুম, কিন্তু পাইলটদের স্ট্রাইকটা দিল ব্যাগড়া...'

বারীন ভৌমিকের গলা শুক্‌নো, ঠোঁটের চারপাশটা অবশ। অথচ তিনি বেশ

বুঝতে পারছেন যে এতগুলো কথার পর কিছু না বললে অস্বাভাবিক হবে, এমন কি সন্দেহজনকও হতে পারে। প্রাণান্ত চেষ্টা করে, অসীম মনোবল প্রয়োগ করে, অবশেষে কয়েকটি কথা বেরোল মুখ দিয়ে—

'আপনি খোঁ-খোঁজ করেননি ?'

'আ-র খোঁজ ! এসব কি আর খোঁজ করে ফেরত পাওয়া যায় ? তবে লোকটার চেহারা মনে রেখেছিলুম অনেক দিন। এখনো আবছা-আবছা মনে পড়ে। মাঝারি রঙ, গোঁফ আছে, আপনারই মতো হাইট হবে, তবে রোগা ! আর একটিবার যদি তার সাক্ষাৎ পেতুম তো বাপের নাম ভুলিয়ে দিতুম। এককালে বক্সিং করতুম, জানেন ? লাইট হেভি-ওয়েট চ্যাম্পিয়ন ছিলুম। সে লোকের চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি যে আর দ্বিতীয়বার আমার সামনে পড়েনি...'

ভদ্রলোকের নামটাও মনে পড়ে গেছে। চক্রবর্তী। পুলক চক্রবর্তী। আশ্চর্য ! ওই বক্সিং-এর কথাটা বলামাত্র নামটা সিনেমার টাইটেলের মতো যেন চোখের সামনে দেখতে পেলেন বারীন ভৌমিক। গতবারও বক্সিং নিয়ে অনেক কথা বলেছিলেন পুলক চক্রবর্তী।

কিন্তু নামটা জেনেই বা কী হবে ? ইনি তো আর কোনো অপরাধ করেননি। অপরাধী বারীন নিজে। আর সেই অপরাধের বোঝা দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। সব স্বীকার করলে কেমন হয় ? ঘড়িটা ফেরত দিলে কেমন হয় ? হাতের কাছে ব্যাগটা খুললেই তো—

দূর—পাগল ! এসব কী চিন্তাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন বারীন ভৌমিক ? নিজেকে চোর বলে পরিচয় দেবেন ? প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী তিনি, তিনি না বলিয়া পরের দ্রব্য নেওয়ার কথা স্বীকার করবেন ? তার ফলে তাঁর নাম যখন ধুলোয় লুটোবে তখন আর গানের ডাক আসবে কোত্থেকে ? তাঁর ভক্তের দলই বা কী ভাববে, কী বলবে ? ইনি নিজেই যে সাংবাদিক নন, বা সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত নন, তারই বা গ্যারান্টি কোথায় ? না। স্বীকার করার প্রশ্নই ওঠে না।

হয়তো স্বীকার করার প্রয়োজনও নেই। পুলক চক্রবর্তী ঘন ঘন চাইছেন তাঁর দিকে। আরো ষোল ঘণ্টা আছে দিল্লী পৌঁছাতে। কোনো এক বীভৎস মুহূর্তে ফস্ করে চিনে ফেলার দীর্ঘ সুযোগ পড়ে আছে সামনে। আরে এই তো সেই লোক !—বারীন কল্পনা করলেন তাঁর গোঁফ খসে পড়ে গেছে, গাল থেকে মাংস ঝরে গেছে, চোখ থেকে চশমা খুলে গেছে ; পুলক চক্রবর্তী এক দৃষ্টে চেয়ে রয়েছে তাঁর ন'বছর আগের চেহারাটার দিকে, তাঁর ঈষৎ কটা চোখের দৃষ্টি ক্রমশ তীক্ষ্ণ হয়ে আসছে, তাঁর ঠোঁটের কোণে ক্রূর হাসি ফুটে উঠছে। হুঁ হুঁ বাছাধন ! পথে এস এবার ! অ্যাদ্দিন বাদে বাগে পেয়েছি তোমায় ! ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ তো দেখনি...

দশটা নাগাৎ বারীন ভৌমিকের কম্প দিয়ে জ্বর এলো। গার্ডকে বলে তিনি একটি অতিরিক্ত কম্বল চেয়ে নিলেন। তারপর দুটি কম্বল একসঙ্গে পা থেকে নাক অবধি টেনে নিয়ে শয্যা নিলেন। পুলক চক্রবর্তী কামরার দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি লাগিয়ে দিলেন। বাতি নেভাতে গিয়ে বারীনের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাকে অসুস্থ বলে মনে হচ্ছে। ওষুধ খাবেন ? ভালো বড়ি আছে আমার কাছে, দুটো খেয়ে নিন। এয়ারকন্ডিশনিং-এর অভ্যাস নেই বোধহয় ?'

ভৌমিক বড়ি খেলেন। একমাত্র ভরসা যে ঘড়ি-চোর বলে চিনতে পারলেও তাঁকে অসুস্থ দেখে অনুকম্পাবশত পুলক চক্রবর্তী কঠিন শাস্তি থেকে বিরত হবেন। একটা ব্যাপার তিনি ইতিমধ্যে স্থির করে ফেলেছেন। পুলক তাঁকে চিনতে না পারলেও, কাল দিল্লী পৌঁছবার আগে কোনো এক সুযোগে সুইস ঘড়িটি তার আসল মালিকের বাক্সের মধ্যে চালান দিতে হবে। যদি সম্ভব হয় তো মাঝরাত্রেই কাজটা সারা যেতে পারে। কিন্তু জ্বরটা না কমলে কম্বলের তলা থেকে বেরনো সম্ভব হবে না। এখনো মাঝে মাঝে সমস্ত শরীর কেঁপে উঠছে।

পুলক তাঁর মাথার কাছে রীডিং ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে রেখেছেন। তাঁর হাতে খোলা একটা পেপার-ব্যাক বই। কিন্তু তিনি কি সত্যিই পড়ছেন, না বইয়ের পাতায় চোখ রেখে অন্য কিছু চিন্তা করছেন ? বইটা একভাবে ধরা রয়েছে কেন ? পাতা উলটোচ্ছেন না কেন ? কতক্ষণ সময় লাগে পাশাপাশি দুটো পাতা পড়তে ?

এবার বারীন লক্ষ করলেন যে, পুলকের দৃষ্টি বইয়ের পাতা থেকে সরে আসছে। তাঁর মাথাটা ধীরে ধীরে পাশের দিকে ঘুরল। দৃষ্টি ঘুরে আসছে বারীনের দিকে। বারীন চোখ বন্ধ করলেন। বেশ কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে রইলেন। এখনও কি পুলক চেয়ে আছে তাঁর দিকে ? খুব সাবধানে চোখের পাতা দুটোকে যৎসামান্য ফাঁক করলেন বারীন। আবার তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে নিলেন। পুলক সটান চেয়ে আছে তাঁর দিকে। বারীন অনুভব করলেন তাঁর বুকের ভিতরে সেই ব্যাঙটা আবার লাফাতে শুরু করেছে। পাঁজরার হাড়ে আবার ধাক্কা পড়ছে—ধুক্‌পুক্‌...ধুক্‌পুক্‌...ধুক্‌পুক্‌...ধুক্‌পুক্‌...। দাদ্‌রার ছন্দ। ট্রেনের চাকার গম্ভীর ছন্দের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে সে ছন্দ।

একটা মৃদু 'খচ্‌' শব্দের সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধ অবস্থাতেই বারীন বুঝতে পারলেন যে কামরার শেষ বাতিটাও নিভে গেছে। এবার সাহস পেয়ে চোখ খুলে বারীন দেখলেন যে দরজার পর্দার ফাঁক দিয়ে আসা ক্ষীণ আলো কামরার অন্ধকারকে জমাট বাঁধতে দেয়নি। সেই আলোয় দেখা গেল পুলক চক্রবর্তী তাঁর হাতের বইটা বারীনের ব্যাগের পাশে রাখলেন। তারপর কম্বলটাকে একেবারে থুতনি অবধি টেনে নিয়ে পাশ ফিরে বারীনের মুখোমুখি হয়ে একটা

সশব্দ হাই তুললেন।

বারীন ভৌমিক টের পেলেন তাঁর হৃৎস্পন্দন ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে আসছে। কাল সকালে—হ্যাঁ, কাল সকালে—পুলকের ট্র্যাভলিং ক্লক তাঁর নিজের ব্যাগ থেকে পুলকের সুটকেসের জামা-কাপড়ের তলায় চালান দিতে হবে। সুটকেসে চাবি লাগানো নেই। একটুক্ষণ আগেই পুলক স্লিপিং সুট বার করে পরেছে। বারীনের কাঁপুনি বন্ধ হয়ে গেছে। বোধহয় ওষুধে কাজ দিয়েছে। কী ওষুধ দিলেন ভদ্রলোক ? নামটা তো জিজ্ঞেস করা হয়নি। অসুস্থতার ফলে দিল্লীর সংগীত-রসিকদের বাহবা থেকে যাতে বঞ্চিত না হন, সেই আশায় অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে পুলক চক্রবর্তীর দেওয়া বড়ি গিলেছেন তিনি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে...

নাঃ, এসব চিন্তাকে প্রশ্রয় দেবেন না তিনি। গেলাসের ঠুনঠুনিকে অ্যালার্ম ক্লক ভেবে কী অবস্থা হয়েছিল। এসবের জন্য দায়ী তাঁর অপরাধবোধ-জর্জরিত অসুস্থ মন। কাল সকালে তিনি এর প্রতিকারের ব্যবস্থা করবেন। মন খোলসা না হলে গলা খুলবে না, গান বেরোবে না। বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন...

চায়ের সরঞ্জামের টুংটাং শব্দে বারীন ভৌমিকের ঘুম ভাঙল। বেয়ারা এসেছে ট্রে নিয়ে চা রুটি মাখন ডিমের অমলেট। এসব তাঁর চলবে কি ? জ্বর আছে কি এখনো ? না, নেই। শরীর ঝরঝরে হয়ে গেছে। মোক্ষম ওষুধ দিয়েছিলেন পুলক চক্রবর্তী। ভদ্রলোকের প্রতি একটা কৃতজ্ঞতার ভাব জেগে উঠল বারীনের মনে।

কিন্তু তিনি কোথায় ? বাথরুমে বোধহয়। নাকি করিডরে ? বেয়ারা চলে গেলে পর বারীন বাইরে বেরোলেন। করিডর খালি। কতক্ষণ হল বাথরুমে গেছেন ভদ্রলোক ? একটা চান্স নেওয়া যায় কি ?

বারীন চান্সটা নিলেন বটে, কিন্তু সফল হলেন না। ব্যাগ থেকে ঘড়ি বার করে পুলক চক্রবর্তীর সুটকেস টেনে বার করার জন্য নিচু হতে না হতেই ভদ্রলোক তোয়ালে ও ক্ষৌরীর সরঞ্জাম হাতে কামরায় এসে ঢুকলেন। বারীন ভৌমিক তাঁর ডান হাতটা মুঠো করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

'কেমন আছেন ? অলরাইট ?'

'হ্যাঁ। ইয়ে...এটা চিনতে পারছেন ?'

বারীন তাঁর মুঠো খুলে ঘড়ি সমেত হাতটা পুলকের সামনে ধরলেন। তাঁর মনে এখন একটা আশ্চর্য দৃঢ়তা এসেছে। চুরির ব্যারাম তিনি অনেক দিন কাটিয়ে উঠেছেন, কিন্তু এই যে লুকোচুরি, সেটাও তো চুরি ! এই ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় কিন্তু-কিন্তু করছি-করব ভাব, এই তলপেট-খালি, গলা-শুকনো, কান-গরম,

বুক-ধুকপুক—এটাও তো একটা ব্যারাম। এটাকে কাটিয়ে না উঠলে নিস্তার নেই, সোয়াস্তি নেই।

পুলক চক্রবর্তী হাতের তোয়ালের একটা অংশ তাঁর ডান হাতের তর্জনীর সাহায্যে সবেমাত্র কানের মধ্যে গুঁজেছিলেন, এমন সময় বারীনের হাতে ঘড়িটা দেখে স্তম্ভিত তাঁর কানেই রয়ে গেল। বারীন বললেন, 'আমিই সেই লোক। মোটা হয়েছি, গোঁফটা কামিয়েছি, আর চশমা নিয়েছি। আমি পাটনা যাচ্ছিলাম, আপনি দিল্লী। সিক্সটি-ফোরে। সেই যে একটি লোক কাটা পড়ল, আপনি দেখতে নামলেন, সেই সুযোগে আমি ঘড়িটা নিয়ে নিই।'

পুলকের দৃষ্টি এখন ঘড়ি থেকে সরে গিয়ে বারীনের চোখের উপর নিবদ্ধ হল। বারীন দেখলেন তাঁর কপালের মাঝখানে নাকের উপর দুটো সমান্তরাল খাঁজ, চোখের সাদা অংশটা অস্বাভাবিক রকম প্রকট, ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে গিয়ে কিছু বলার জন্য তৈরি হয়েও কিছু বলতে পারছে না। বারীন বলে চললেন—

'আসলে ওটা আমার একটা ব্যারাম, জানেন। মানে, আমি আসলে চোর নই। ডাক্তারিতে এর একটা নাম আছে, এখন মনে পড়ছে না। যাই হোক, এখন আমি একেবারে, মানে, নরম্যাল। ঘড়িটা অ্যাদ্দিন ছিল, ব্যবহার করেছি, আজও সঙ্গে রয়েছে, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল—প্রায় মিরাক্‌লের মতো—তাই আপনাকে ফেরত দিচ্ছি। আশা করি আপনার মনে কোনো...ইয়ে থাকবে না।'

পুলক চক্রবর্তী একটা অস্ফুট 'থ্যাঙ্কস' ছাড়া আর কিছু বলতে পারলেন না। তাঁর হারানো ঘড়ি তাঁর নিজের কাছে ফিরে এসেছে, হতভম্বভাবে সেটি হাতে নিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। বারীন তাঁর ব্যাগ থেকে দাঁতের মাজন, টুথব্রাশ ও দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম বার করে তোয়ালেটা র‍্যাক্‌ থেকে নামিয়ে নিয়ে কামরার দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে নজরুলের 'কত রাতি পোহায় বিফলে' গানের খানিকটা গেয়ে বুঝলেন যে তাঁর কণ্ঠের স্বাভাবিক সাবলীলতা তিনি ফিরে পেয়েছেন।

ফাইনান্সের এন. সি. ভৌমিককে টেলিফোনে পেতে প্রায় তিন মিনিট সময় লাগল। শেষে একটা পরিচিত গম্ভীর কণ্ঠে শোনা গেল 'হ্যালো'।

'কে, নীতীশদা ? আমি ভোঁদু।'

'কীরে, তুই এসে গেচিস ? আজ যাব তোর গলাবাজি শুনতে। তুইও একটা কেউকেটা হয়ে গেলি শেষটায় ? ভাবা যায় না !...যাক, কী খবর বল্‌। হঠাৎ নীতীশদাকে মনে পড়ল কেন ?'

'ইয়ে—পুলক চক্রবর্তী বলে কাউকে চিনতে ? তোমার সঙ্গে নাকি স্কটিশে

পড়ত। বক্সিং করত।'

'কে, ঝাড়ুদার ?'

'ঝাড়ুদার ?'

'ও যে সব জিনিসপত্তর ঝেড়ে দিত। এর-ওর ফাউন্টেন পেন, লাইব্রেরির বই, কমন-রুম থেকে টেবিল টেনিস ব্যাট। আমার প্রথম রনসনটা তো ওই ঝেড়েছিল। অথচ অভাব-টভাব নেই, বাপ রিচ ম্যান। ওটা এক ধরনের ব্যারাম, জানিস তো ?'

'ব্যারাম ?'

'জানিস না ? ক্লেপ্‌টোমেনিয়া। কে-এল-ই-পি...'

টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে বারীন ভৌমিক তাঁর খোলা সুটকেসটার দিকে দেখলেন। হোটেলে এসে সুটকেস খুলতেই কিছু জিনিসের অভাব তিনি লক্ষ করেছেন। এক কার্টন থ্রী কাস্‌লস সিগারেট, একটা জাপানী বাইনোকুলার, পাঁচটা একশো টাকার নোট সমেত একটা মানি-ব্যাগ।

ক্লেপ্‌টোমেনিয়া। বারীন নামটা জানতেন, কিন্তু ভুলে গেছিলেন। আর ভুলবেন না।